মুলো—র‍্যাডিশ—হর্স র‍্যাডিশ

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

নবীনবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া কয়লা চাকরকে ডাকাডাকি করিতেছেন শুনিতে পাইয়াও আবার চাদর মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া এবং তার একটু পরে বোধ হয় ঘুমাইয়াও পড়িয়াছি। জানালার ফাঁক দিয়া পাশের আতাগাছের ডাল যখন দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি রোদের মধ্যে ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তখন কয়লার ডাকে তন্দ্রা ভাঙিল।

—বাবুজি, চা তৈয়ার !

—চা ?এখানে নিয়ে আয়, বিছানায়।

নবীনবাবু বোধ হয় প্রাতভ্রমণ সারিয়া আমার ঘরের পাশের সরু করিডোর দিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমার আলস্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই বেশ জোরে জোরে পা ফেলিয়া গেলেন। চা-পান বিছানায় বসিয়াই শেষ করিয়া উঠিব-উঠিব ভাবিতেছি, এমন সময় নবীনবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার বিছানার পাশের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—উঠুন মশাই, যোধপুরী মুলো এসেছে, র‍্যাডিশ !

আমি চটি পায়ে দিতে দিতে বলিলাম—হর্স র‍্যাডিশ ?একা, না মিস সোরাবজিকে নিয়ে ?

নবীনবাবু রাগ করিয়া বলিলেন—আসুন না, উঠেই আসুন না। মিস সোরাবজির বাবা-মার দায় পড়েছে ওর সঙ্গে মেয়েকে পাঠাতে সকাল বেলা। একাই এসেছে।

পরে পিছন ফিরিয়া বলিলেন—আচ্ছা, রোজ রোজ কেন সকালে এসে জোটে বলুন তো ?কি কাজ এখানে বাপু তোর ?বিরক্ত করলে ! আর আপনিও আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবেন না একদিনও—

বলিলাম—আপনার উক্তি দুটির মধ্যে পরস্পর-সম্বন্ধটা কি ভালো বুঝলাম না নবীনদা—

—বুঝবেন বুঝবেন—শিগগিরই বুঝবেন। যদি সকালে সকালে বেরিয়ে যাই, তাহলে তো আর এ হাঙ্গামা এসে জোটে না সকালবেলা। এখন চা করো রে, খাওয়াও রে, ভ্যাজ ভ্যাজ করে বকো রে—

—নবীনবাবু, শিওরলি ইউ ডোন্ট গ্রাজ ইওর গেস্ট এ কাপ অব টি।

—থাক থাক হয়েছে—গেস্ট ! ভারি আমার গেস্ট রে !

যাহার অভ্যর্থনার আয়োজন এত হৃদ্যতাপূর্ণ, সে বেচারি নির্বিকারভাবে হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। আমায় দেখিয়াই হাত বাড়াইয়া পরম বন্ধুত্বের সুরে বলিল—গুডমর্নিং মিস্টার রায় !

আমি হাত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে পরিপূর্ণ অমায়িকতার সঙ্গে বলিলাম—গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ কাম মি শুকরাম—গুডমর্নিং !

নবীনবাবু উদাসীনভাবে অতিথির করমর্দন করিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, বসুন মি. শুকরাম। আমি একবার জেনারেল পোস্টাপিস থেকে একটা তার করে আসি, আপনি ততক্ষণ চা খান।

আমার দিকে চাহিয়া বাংলায় বলিলেন—মুলোকে শিগ্‌গির ভাগাবার চেষ্টা করুন। আজ এখুনি আমাদের বেরুতে হবে, কাজ আছে অনেক।

মুলোযাহাকে বলা হইয়াছে সে বাংলার একবর্ণও বোঝে না তাই রক্ষা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা ইংরেজিতেই হয়।

মুলো জাঁকিয়া বসিয়া আমায় বলিল—বাঙালিদের মতো লুচি কবে খাওয়াচ্ছেন মি. রায় ?ও আমার বড় ভালো লাগে। আমি বাঙালিদের সঙ্গে একবার মিশেছিলাম—লুচি খাইয়েছিল। সে এখনো ভুলিনি।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম—নবীনদার পিত্তি জ্বলে যেত—যদি কথাটা শুনত। ভাগ্যিস নেই এখানে ! যে অভ্যর্থনার ঘটা তাঁর ! কয়লা চাকরকে ডাকিয়া খানকতক লুচি ভাজিতে বলিতে গিয়া শুনিলাম ঘি ও ময়দা বাজার হইতে না আনিলে চলিবে না, ফুরাইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম অতিথির অদৃষ্টে লুচি নাই। নবীনবাবু হয়তো ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িতে পারেন। দরকার নাই সেসব হাঙ্গামায়। চা ও টোস্ট খাওয়াইয়া দিলাম মুলোকে।

মুলো তাহার স্বভাবসিদ্ধভাবে বকিতে শুরু করিয়া দিল। বকুনি আর থামায় না, বেলা নটা বাজিয়া গেল, তবুও তাহার হুঁশ নাই। ইতিমধ্যে নবীনবাবু আসিয়া পড়িলেন, মুলোকে তখনো বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্তির সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আমায় বলিলেন—মুলোটা এখনো যায়নি ?হর্স র‍্যাডিশটা ?

—না গেলে তো তাড়িয়ে দিতে পারি নে ! ও বলছে আমাদের সঙ্গে খিন্‌সি লেক দেখতে যাবে।

—মাটি করেছে ! সারলে দেখছি !

মুলো আমাদের কথাবার্তা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মি. রায় খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে কি বলছেন ?

নবীনবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, অবশ্য ইংরেজিতে—খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করছি ওর সঙ্গে। আপনি আসবেন নাকি আমাদের সঙ্গে ?

—নিশ্চয় মি. বোস, খুব খুশির সঙ্গে।

—বেশ বেশ। বড় আনন্দ হল। বড় খুশি হলাম।

আমি বলিলাম—মি. শুকরামের মতো সঙ্গী পেলে খিন্‌সি তো খিন্‌সি; উত্তর মেরুতে গিয়েও সুখ আছে।

নবীনবাবু ইংরেজিতে সায়সূচক কথা বলিয়া আমায় বাংলাতে বলিলেন—স্বর্গেও যদি যাও মুলোকে নিয়ে স্বর্গের হাওয়া পর্যন্ত তেতো হয়ে উঠবে, ওকে ভাগাবার চেষ্টা করো।

মুলো বলিল—তাহলে কখন রওনা হব আমরা, মি. বোস ?

—রওনা ?সে তো এখনো ঠিক হয়নি, দেখি—

—যদি বলেন আমার এক জানাশুনো গাড়ি আছে—পেট্রোলের খরচটা দিলেই রাজী হয়ে যাবে। বলব তাকে ?

—বলুন না, বেশ বেশ !

আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

পরদিন মুলোর চেষ্টাতে গাড়ির জোগাড় হইয়া গেল। আহারাদি সারিয়া আমরা তিনজনে শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী খিন্‌সি হ্রদ দেখিতে রওনা হইলাম। নাগপুর জব্বলপুর রোডের যে স্থান হইতে খিন্‌সি হ্রদের রাস্তা বাহির হইল, ঠিক সেই জায়গাটিতে পড়ে মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজখনি।

মুলো আমাদের সঙ্গে আসিতে পাইয়া বড়ই খুশি হইয়া উঠিয়াছে এবং ভীষণ বকুনি শুরু করিয়াছে। নবীনবাবু বাংলায় বলিলেন—মুলোটা তো বড় জ্বালাচ্ছে হে ! ওকে এই ম্যাঙ্গানিজের মাইনে রেখে গেলে কেমন হয় ?

মুলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মি. বোস ?

তাহার সব বাংলা কথার মানে জানা চাই।

নবীনবাবু উত্তর দিলেন—এই ম্যাঙ্গানিজ খনিটা ইন্ডিয়ার মধ্যে একটা বড় খনি তাই বলছি।

নাগপুরে আমরা দুজনে আসিয়াছি বেড়াইতেও বটে, কিছু ইনসিওরের আসামী জোগাড় করিতেও বটে। সিভিল লাইনে কোতোয়াল সাহেবের বাংলো ভাড়া লইয়া যেদিনটা বারান্দায় ক্যানভাসের আরাম-কেদারা পাতিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছি—সেদিন এবং সেই মুহূর্তে এই লোকটি আসিয়া আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়াছে। একটি তরুণ যুবককে বাড়িরহাতায় ঢুকিতে দেখিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলাম এবং ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাকে চান ?

যুবকটির চেহারা একহারা, দাঁত উঁচু, শ্যামবর্ণ, মুখে দুই-একটা বসন্তের দাগ, ছোট ছোট চোখ, পরনে নিখুঁত সাহেবি পোশাক। সে একগাল হাসিয়া বলিল—আপনারা এই বাসা ভাড়া নিয়েছেন ?বাঙালি ?সে আমি দেখেই বুঝেছি। সেইজন্যেই এলাম—বাঙালির সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আমার অনেক দিন থেকে আছে।

বলিলাম—আসুন বসুন। এইখানেই বাড়ি বুঝি ?

যুবক পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল—দেশ আমার যোধপুর। এখানে কলেজে পড়ি—ফোর্থ ইয়ারে।

—বেশ বেশ। একটু চা খান—

সেই হইতে ইহার যাতায়াত শুরু। এমন একটি দিন যায় নাই, যেদিন ছোকরা দুবেলা আসে নাই এবং নানাপ্রকার আলোচনার অবতারণা করে নাই। দিন কয়েক পরেই নবীনবাবু এবং আমি আবিষ্কার করিলাম যে ছোকরা কিছু স্থূলবুদ্ধি, ঠিক সকালে ও বিকেলে চা-পানের আগে আসিয়া জুটিবে এবং দুপুর পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া শুধু বকিবে—উঠিবার নামটি করিবে না। বাধ্য হইয়া প্রায়ই দুপুরে বা রাত্রে—কোনো কোনো দিন দুবেলাই তাহাকে খাইতে বলিতে হইয়াছে। সে খাইয়াছেও। এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিতে পারে না।

হয়তো নবীনবাবু বলিলেন—মি.শুকরাম (তাহার নাম রত্নাকর শুকরাম জৈন), ওবেলা আমরা একটু হাইল্যান্ড ড্রাইভে যাব, বিকেলটাতে থাকব না।

—বেশ বেশ, আমি সন্ধের পর আসব।

—ও, তা বেশ। তবে বোধ হয় ফিরতে একটু দেরিই হবে।

—না হয় আমি একটু রাত করেই আসব এখন। আপনারা অনেক উঁচু বিষয়ে কথাবার্তা বলেন—আমার শুনতে বড় ভালো লাগে। এই জন্যেই আমি বাঙালিদের সঙ্গে মিশতে বড় ভালোবাসি। তা এখানে বাঙালি বেশি নেই—যাঁরা আছেন, তাঁরা বড় মেশেন না।

এই ধরনের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়ার দরুন আমরা তাহাকে 'মুলো' আখ্যা দিলাম এবং তাহার সাক্ষাতে পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বাংলায় তাহাকে 'মুলো' বলিয়া উল্লেখ করিতাম। কখনো কখনো 'মুলো'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া তাহার সামনেই তাহাকে 'র‍্যাডিশ', কখনো 'হর্স র‍্যাডিশ' বলিতাম। বেচারা আমাদের বাংলা কথার অর্থ একবর্ণও বুঝিত না। 'মুলো' কথার ইডিয়মগত অর্থই বা বুঝিবে কিরূপে ?মাঝে মাঝে আমাদের মুখে 'র‍্যাডিশ', 'হর্স র‍্যাডিশ' শুনিয়াও কিছু না বুঝিয়া হয়তো ভাবিত—ইহারা এ তিনটা কথা এত ব্যবহার করে কেন ?

আমরা আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বটে, কিন্তু 'মুলো'র বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বিশেষ নয়, একজন ভালো বাঙালি ম্যাট্রিক ছাত্র তাহার অপেক্ষা অনেক কিছু জানে। বলা বাহুল্য অবাঙালি ছাত্রদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বভাবত খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রামোঃ, এখানে মানুষ আছে কে ?

আমাদের এই মনোভাবের পটভূমিকায়আসিয়া উপস্থিত হইলে মুলোর ন্যায় একজন স্থূলবুদ্ধি ছাত্রের যে দুর্দশা এরূপ দাঁড়াইবে আমাদের বিচারের মাপকাঠিতে ইহা আর বেশি কথা কি !

মজার ব্যাপার এই, যাহাকে লইয়া এই ব্যাপার সে কিছুই বুঝিত না। বরং ভাবিত, আমাদের মতো অমায়িক বাঙালি ভদ্রলোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে লাভবান হইয়াছে। এজন্য সে মাঝে মাঝে গর্বও করিত।

মুলোর মুখে শুনিয়াছিলাম ম্যাঙ্গানিজ খনির ম্যানেজারের সঙ্গে তার আলাপ আছে। গাড়ি জব্বলপুর রোডের উপর খনির সামনে দাঁড়াইতেই সে দোর খুলিয়া ছুটিয়া গেল ম্যানেজারকে খবরদিতে। যেন আমরা লাটসাহেব

আসিয়াছি মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি দর্শন করিতে—এমনভাবে সে হন্তদন্ত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। ইনি মি. বোস, উনি মি. রায়—বাঙালি, খুব পণ্ডিত লোক ওঁরা দুজনেই। আমার বিশেষ বন্ধু।—কি মুশকিল ! পাণ্ডিত্যের মধ্যে তো আমরা করি ইন্‌সিওরেন্সের দালালি ! অবশ্য আমাদের প্রাচীন কীর্তি ও পুরাতত্ত্বের ওপর কিছু ঝোঁক আছে। কিন্তু সে ফটোগ্রাফির দিক হইতে, বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের দিক হইতে নয়।

মুলোর কাণ্ড দেখিয়া আমরা মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলাম।

ম্যানেজার নাগপুরের লোক, চিন্দওয়ারা জেলার অধিবাসী, বেশ ইংরেজি বলে। জব্বলপুর রোডে গাড়ি দাঁড় করাইয়া আমরা প্রায় দু'শ ফুট চড়াই ভাঙিয়া খনির মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। একটা ক্ষুদ্র ডন্‌কি এঞ্জিনে খাদের জল তুলিয়া লম্বা রবার ও তারের নল দিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে ছোটখাটো একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে—সেটা দেখিয়া আমরা সকলে খুশি হইলাম।

ম্যানেজার আমাদের চা-পান করিতে বলিলে আমরা অস্বীকার করিয়া আবার নীচে নামিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলাম। ম্যানেজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম, কষ্ট করিয়া আমাদের সব দেখাইবার জন্য। গাড়ি পুনরায় চলিল।

নবীনদা কহিলেন—মুলো বড্ড গণ্ডগোল করে। আমাদের নিয়ে এমন করছিল... !

মুলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মি. বোস ?

তাহার আবার সকল কথারই মানে জানা চাই।

নবীনদা বলিলেন,—চমৎকার খনিটা, তাই বলছিলাম।

—ও, তা র‍্যাডিশের কথা কি বলছিলেন ?এখানে তো র‍্যাডিশ পাওয়া যায় না !

আমরা দুজনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। নবীনদা বলিলেন,—ওটা একটা বাংলা ইডিয়ম মি. শুকরাম। ভালো জিনিসকে বাংলায় আমরা মুলো বলি।

—তাই নাকি ?হাউ ইন্টারেস্টিং।

আমি বাংলায় বলিলাম,—তোমার মুণ্ডু—বোকারাম কোথাকার !

নবীনদা বলিলেন,—মুলো আর সাধে বলে ! একেবারে হর্স র‍্যাডিশ !

রামটেকের পাহাড় বাঁদিকে রাখিয়া কিছু দূর গিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের নিবিড় ছায়াভরা বীথি-পদে চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া মোটর অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতেছে। শরৎ-অপরাহ্নের অপূর্ব শোভা বনতলে। কোথায় যেন পাকা আতার গন্ধ, দু-একটা বনফুলের সুবাসের সঙ্গে যেন শেফালীর পরিচিত সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে বাতাসের ঝাপ্‌টায়। এমন শোভার মধ্যে বসিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য ইন্‌সিওরেন্সের দালালি বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

খিন্‌সি হ্রদে উঠিবার সময় পাহাড়ের পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ। অনেক দূর উঠিয়া গেলে শৈলবেষ্টিত হ্রদের শান্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্দিকের শৈলসানু ঘন বনে সমাকীর্ণ, স্থানটা নিতান্ত নির্জন। একদিকে অপরাহ্নের ছায়া, অপর পারের পাহাড়ের গায়ে হলুদ রঙের রোদ। হ্রদের এপারের ডাকবাংলোয় গিয়া আমরা চৌকিদারকে ডাকিয়া চেয়ার বাহির করাইয়া বসিলাম। চৌকিদার আমাদের নির্দেশমতো চায়ের জল চড়াইতে ছুটিল।

নবীনদা ও আমি হ্রদের জলে স্নান করিবার জন্য নামিলাম। বনের মধ্যকার সরু পথ ধরিয়া কতদূর নামিয়া গেলাম দুজনে। মুলো এসব ভালোবাসে না, সে ডাকবাংলোর বারান্দাতে বসিয়াই রহিল। জলের উপরে বুনো শিউলি ফুলের রাশি সকালের রোদে ঝরিয়া পড়িয়াছে— দু'তিন দিনের জমানো ফুলের রাশ। আমরা জলের ঢেউ একপাশে সরাইয়া দিয়া স্নান করিলাম।

নবীনদা বলিলেন,—বাঘ নেই তো ?বড্ড জঙ্গল চারিধারে—

—আশ্চর্য নয় কিছু !

—মুলোটাকে বাঘে না নিয়ে যায়। একা বসে আছে—

—কেন, ড্রাইভার ?

—ও চৌকিদারের সঙ্গে গিয়েছে। বলে গেল ফিরতে আধঘণ্টা দেরি হবে, দুধ আনতে গেল। ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া দেখি মুলো নির্বিকারচিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছে। নাগপুর হইতে আনা বম্বে ক্রনিক্‌ল্, আগের তারিখের। আমাদের দেখিয়া বলিল—আমেদাবাদের দুটো মিলে স্ট্রাইক হয়েছে বড় জোর—

নবীনদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—মুলোর কাণ্ড শোন—এমন একটা জায়গায় এসে ওর এখন আমেদাবাদের মিলের কথা বড্ড দরকারী হল !

কিছুক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ড্রাইভার তাড়াতাড়ি করিতে বলিল। পাহাড়ের পথ, তাহার গাড়ির আলোটা ভালো নাই—আমরা দেরি করিলে শেষে মুশকিলে পড়িতে হইবে।

মুলো বলিল—চলুন মি. বোস। আজ যাওয়া যাক, আর কি দেখবেন, দেখা তো হয়ে গেল—

—নবীনদা বলিলেন—তোর মুণ্ডু হল—হতভাগা হর্স র‍্যাডিশ !

মুলো বলি—কি ?

—মানে আমাদের এখন যাওয়াই দরকার, তাই বলছি।

—হোয়াট হ্যাজ হর্স র‍্যাডিশ ?টু ডু উইথ ইট ?

—বাংলা ইডিয়ম—ওর মানে মুলো খেতে যেমন ঝাল, অথচ দেখতে রাঙা তেমনি, এ জায়গা যতই ভালো হোক—মানে—এই গিয়ে—

আমি নবীনদার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—ঠাণ্ডা লাগতে পারে, তাই তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত—বাংলা ইডিয়ম। মুলো হাসিতে লাগিল। বলিল—ফানি, দ্যাট র‍্যাডিশ ইজ অলওয়েজ মিক্সড্ উইথ ইওর বেঙ্গলি ইডিয়ম্‌স্ !

খিন্‌সি হ্রদের পাহাড় হইতে নামিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের কুসুমাস্তৃত পথে আমরা রামটেক পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছিলাম। নবীনদার আদেশে ড্রাইভার নাগপুরের রাস্তা ছাড়িয়া বন্য আতাবৃক্ষ শোভিত রামটেক পাহাড়ের ঘোরানো পথ ধরিল। মুলোর এ জিনিসটা মনঃপূত হইল না। সে দু-একবার মৃদু প্রতিবাদও করিল, বিশেষ কোনো ফল হইল না। আসল কথাটা আমরা জানিতাম। মিস সোরাবজি নামে একটি পার্শী তরুণীর সঙ্গে মুলো ভাব জমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে আজ মাস ছ'সাত ধরিয়া। মেয়েটির বাবা নাগপুরের ডাক্তার, তাহাদের বাড়ি সন্ধ্যাবেলাটা কাটানো মুলোর অনেকদিনের অভ্যাস, যদিও মেয়ের বাপ-মা তাহা যে খুব পছন্দ করে তাহা নয়। মুলোর মুখে শুনিয়াই বুঝিয়াছি, তাহারা মুলোকে এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, এত ঘন ঘন সে যেন তাহাদের বাড়ি না আসে। কিন্তু মুলোর বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির স্থূল আবরণ তাঁহারা ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই।

পাহাড়ের নীচে গাড়ি রাখিয়া আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরিস্থিত রামসীতার মন্দিরে উঠিতেছি। মুলো বলিল,—মি.রায়, একদিন মিস সোরাবজি বলেছিল রামটেকের মন্দির দেখবে, বড় ভালো হত যদি আজ আনতাম।

নবীনদা আমার গা টিপিলেন। আমার হাসি পাইতেছিল, অতি কষ্টে চাপিলাম।

পাথরে বাঁধানো অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির দু'ধারে অসংখ্য বন্য আতা, পড়াসি ও তিন্দুক গাছের নিবিড় বন। ডান দিকে অনাবৃত পর্বতগাত্র হেলিয়া থাকিয়া দৈত্যপুরীর মাইলস্টোনের মতো দেখাইতেছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়ামাখা নিস্তব্ধতার মধ্যে। পেশোয়াদের নির্মিত এই শৈলমন্দির দুর্গটি ভারতের

অতীত গৌরবের বার্তা বহন করিয়া আনিয়া দিতেছিল আমাদের কানে কানে। শুধু সে গাম্ভীর্যময় নিস্তব্ধতায় তপোভঙ্গ হইতেছিল মুলোর অসম্ভব বকুনি দ্বারা। উপরে উঠিয়া আমরা বিগ্রহ দর্শন করিলাম। সামান্য কিছু প্রসাদ ও চরণামৃত পাইলাম। উঁচু পাহাড়ের উপর মন্দির, অনেক নীচে একদিকে রামটেকের বাজার।

মুলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হইত, যদি সে এখানে আসিয়া মিস সোরাবজি সম্বন্ধে কিছু বলিত—আমরা ভাবিতাম লোকটার প্রাণে তবুও কবিত্ব আছে। কিন্তু মন্দির-দুর্গের প্রাচীরের উপর বসিয়া আমরা যখন দূরের জ্যোৎস্নালোকিত খিন্‌সি হ্রদের দিকে চাহিয়া আছি, মন্দিরে প্রাচীন মারাঠী পুরোহিত রামসীতার আরতি করিতেছেন, পেশোয়াদের আমলের প্রথানুযায়ী আরতির সময় গম্ভীর নির্ঘোষে রণবাদ্য দামামা ও ডগর বাজিতেছে, ওইদিকে বহুদূরে কাম্‌টি ক্যান্টনমেন্টের ক্ষীণ সারি, তখন যদি সে তাহার প্রণয়িনীর কথা তুলিত—আমরা ভাবিতাম এই রামগিরি আশ্রমে জনকতনয়ার স্নানহেতু পুণ্যোদকের স্পর্শে হর্স র‍্যাডিশ বুঝি কালিদাসের বিরহী যক্ষের দশা পাইয়া বসিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়, সে মহাড়ম্বরে গল্প জুড়িয়া দিল—দেশের এক মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে সে কি করিয়া ভোট জোগাড় করিয়া দিয়াছিল ! তাহা হইতে নামিল তাহাদের দেশে কি করিয়া 'ফুটেরি' তৈরি করে। আমরা কহিলাম—ফুটেরি কি ?

মুলো হাত দিয়া গোলাকার জিনিস দেখাইবার ভঙ্গিতে বলিল—এই এত বড় বড়, আটার তৈরি, ভেতরে ছাতু। ঘুঁটের আগুনে সেঁকে ঘি দিয়ে খায়, আলুর চোখা আর বেগুনের ভর্তার সঙ্গে।

নবীনদা বলিলেন—মুলোর সঙ্গে নয় ?

—নো, র‍্যাডিশ ইজ নট ইট্‌ন্—

—আশ্চর্য !

—হোয়াই আশ্চর্য ?র‍্যাডিশ ইজ মাচ রেলিশ্‌ড্ ইন বেঙ্গল ইট সিম্‌স্—বাট নট সো ইন আওয়ার কান্ট্রি !

—বুঝলাম।

—আচ্ছা, এই দুর্গের পাঁচিলটা এত চওড়া কেন ?

মুলোর স্থূল বুদ্ধিতে আর কতটুকু বোঝা সম্ভব ?তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, পেশোয়দের সময়ে এই মন্দিরটি দুর্গের মতো করিয়াই তৈরি হয়—আসিবার পথে অতগুলি ফটক দেখিয়া তাহা সে নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করিয়াছে। পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ এই মন্দির-দুর্গ নির্মাণ করিয়া এখানে একটি গুপ্ত ধনাগার স্থাপন করেন। আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে নাগপুর হইতে বিশ-বাইশ ক্রোশ দূরবর্তী এই অরণ্যাবৃত পাহাড়ের চূড়ায় রামসীতার মন্দিরে তাহার ধনভাণ্ডার অনেকটা নিরাপদ থাকিবার ভরসাতেই এটি নির্মিত হয়। বিশেষত তখনকার যুগে না ছিল রেল, না ছিল এখনকার দিনের মতো চওড়া মোটর রোড। রামটেকের পাহাড় ছিল দুর্গম অরণ্যভূমির অন্তরালে—শত্রু সন্দেহ করিবে না যে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কোন্ পাহাড়ে রামসীতার মন্দির—সেখানে আবার ধনভাণ্ডার থাকিতে পারে। তবুও সাবধানের মার নাই ভাবিয়া বালাজি বিশ্বনাথ মন্দিরটিকে দুর্গের মতো করিয়া নির্মাণ করেন—মন্দিরকে মন্দির, দুর্গকে দুর্গ। আবশ্যক হইলে কিছুকাল ধরিয়া এখানে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করাও চলিতে পারিত। জলের অভাব দূর করিবার জন্য পাহাড়ের নীচে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়—আসিবার সময় যে পুকুরটা ডান দিকে পড়িয়াছিল। মুলো আমার মুখে রামটেকের মন্দিরের ইতিহাস শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আপনি এসব নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছেন দেখছি, বহুৎ পড়াশুনো করেছেন। এইজন্যেই তো বাঙালিদের আমি বড় ভালোবাসি—বাঙালির সঙ্গে আলাপ করলে আমার মন বড় খুশি হয়।

মন্দিরের আরতি থামিয়াছিল। আমি বলিলাম—এখানে একটা অস্ত্রাগার আছে বইয়ে পড়েছি—চলুন সেটা দেখে আসি সবাই, এখনো আছে বলে জানি।

মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রংড়ে ব্রাহ্মণ, পূর্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি প্রথমে মৃদু আপত্তি তুলিলেন, রাত্রে অস্ত্রাগার দেখানোর নিয়ম নাই—অবশেষে আমাদের নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া, বিগ্রহ যেখানে থাকেন তাহার পাশের একটা কুঠুরি খুলিয়া দিলেন। আমরা টর্চের আলোয় সেখানে মারাঠী যোদ্ধাদের প্রকাণ্ড চওড়া দু'ধার তলোয়ার, সাতহাত লম্বা বন্দুক, বিশাল ঢাল, লোহার জালের টুপি ও বর্ম, নানা রকমের তীর, আরো কত কি অস্ত্রশস্ত্র দেখিলাম। যোদ্ধৃজাতির যুদ্ধেরউপকরণ পাঁচরকম থাকিবে—ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। প্রশংসার ভাব মনে জাগিত হয়তো, যদি বর্গির হাঙ্গামার কথা মনে না উঠিত।

মুলো বলিল—আর কি, যোধপুর ওল্ড ফোর্টে একটা মিউজিয়াম আছে, সে এর চেয়ে অনেক বড় !

কোনো কিছু দেখিয়া আশ্চর্য হইবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা—এ ক্ষমতা সকলের থাকে না, মুলোর মধ্যে তাহা থাকিবার আশা করি নাই; সুতরাং বিস্মিত হইলাম না।

নবীনদা বলিলেন—আপনাদের দেশে যোধপুরে একবার নিয়ে যাবেন আমাদের ?অস্ত্রাগার দেখে আসব !

—নিশ্চয়ই ! ইন ফ্যাক্ট, আমাদের নিজ বাড়িতেই একটি অস্ত্রাগার আছে, আমার পূর্বপুরুষের আমলের।

—বলেন কি মি.শুকরাম !

—হাঁ।আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন আওরঙ্গজেবের আমলের লোক। তাঁর নাম—আচ্ছা নোটবুক দেখে বলব। আমরা হলাম ডোগরা রাজপুত—ওয়ারিয়ার ক্ল্যান ডোগরা রাজপুত জানেন তো ?আমাদের সেই পূর্বপুরুষ, তিনি লড়েছিলেন জয়সিংহের সৈন্যদলে। এখনো অস্ত্রাগারের পুজো হয় আমাদের বাড়ি। ধূপধুনো জ্বালাতে হয়, সিঁদুর মাখাতে হয়—

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—সাবাস মুলো ! ডোগরা রাজপুত হয়ে মরতে এসেছ কেন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিতে ?ও কি তোমার হবে ?

আমিও বাংলায় জবাব দিলাম—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া, মুলোর দুকূলই গিয়েছে। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা নেই, লেখাপড়ারও বুদ্ধি নেই—একে বলে হর্স র‍্যাডিশ !

মুলো বলিল—কি ?

নবীনদা বলিলেন—কি রকম বড় বংশে জন্ম আপনার তাই বলছি—ডোগরা রাজপুত যোদ্ধা জাত কিনা !

মুলো বলিল—যাক মি.বোস, একটু চা খাওয়ার জোগাড় হয় না ?চা না খেলে আর তো চলে না।

মন্দির হইতে নামিয়া রামটেকের বাজারে চায়ের দোকানে চা-পান করিয়া নাগপুরে ফিরিলাম। এত ভালো ভালো জিনিস যে সারাদিন ধরিয়া দেখিলাম, মুলো সেসব সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। তাহার যতসব বাজে গল্প আর অনবরত বকুনির জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না।

পরদিন সকালবেলা মুলো আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আপনাদের ওবেলা আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় ?

—মিস সোরাবজির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ।

—আমরা কেন ?

—আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন ওঁর বাবা।

আমরা বিকালে সাজগোজ করিয়া বসিয়া আছি, মুলো আর কিছুতেই আসে না। নবীনবাবু বলিলেন,—ওহে, মুলোটার মতলব শুনে আমাদের হাইল্যান্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দেখছি, ও এল না !

এমন সময় মুলো আসিয়া হাজির হইল—সে নিখুঁত সাজপোশাক করিয়া কোটের বোতামে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া রুমালে এসেন্স ঢালিয়া আসিয়াছে এবং বোঝা গেল যে সে কিছু পূর্বে নাপিতের দোকান হইতে চুলও কাটিয়া আসিয়াছে।

মিস সোরাবজির পিতা এখানকার ডাক্তার। পূর্ব হইতেই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল—বৃদ্ধ অতি অমায়িক লোক। দেখিলাম তিনি শুধু আমাদের তিনজনকে চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা নহে, শহরের আরো আট-দশটি ভদ্রলোককে বলিয়াছেন—তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উৎসব চা-পার্টির আসল কারণ।

মিস সোরাবজি আঠারো-উনিশ বছরের একহারা মেয়ে, আমরা তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। খাঁড়ার মতো উঁচু সুচালো নাকের জন্য কোনোদিনই মিস সোরাবজিকে বিশেষ সুন্দরী বলিয়া আমার মনে হয় নাই—যদিও রং বেশ ফরসা ও গলার সুর কষ্টকৃত মেমসাহেবিয়ানার দোষমুক্ত না হইলেও মন্দ নয়। মেয়েটি নাকি লেখাপড়াতে ভালো।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম আমরা দুজনেই। মিস সোরাবজি মুলোর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট অন্তত হাবভাবে আমাদের তাহাই মনে হইল। বাহিরের বারান্দায় দুজনে নির্জনে মাঝে মাঝে যাইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। মুলোর এতটুকু ইচ্ছাও যেন মিস সোরাবজি তখনই পূর্ণ করিতে ব্যগ্র। অতিথির প্রতি যতটুকু কর্তব্য করা উচিত শেষ করিয়া মেয়েটি মুলোকে লইয়া সব সময় ব্যস্ত রহিল।

চা-পার্টি হইতে ফিরিবার পথে মুলো কি আমাদের ছাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

কিন্তু তাহার যা স্বভাব,—মিস সোরাবজি সম্বন্ধে একবারও একটি কথাও বলিল না। চা-পার্টির কথাই যেন তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে এটুকু সময়ের মধ্যে।

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা ! কলেজের বেশ ভালো মেয়ে বলে শুনেছি র‍্যাডিশটার মধ্যে কি পেলে খুঁজে !

দু দিন মুলো কি জানি কেন আমাদের বাংলোতে আসিল না। তৃতীয় দিন সকালবেলা একখানা মোটরগাড়ি বাসার সামনে দাঁড়াইতেই আমি আগাইয়া গেলাম—নবীনদা তখন বাসায় নাই। মোটর হইতে নামিলেন ডা. সোরাবজি। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—শুকরাম কি এখানে এসেছিল ?একটা জরুরি কথা আছে, আপনারা ওকে কতদিন জানেন ?

—খুব বেশি দিন নয়। কেন বলুন তো ?

—ও আমার কাছে কিছু বলে না। কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। আমি ওকে বাড়ি ঢুকতে দেব না। ওকে আপনারা বারণ করে দেবেন।

মুলোর হইয়া ওকালতি করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ওকে কি উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করেন না ?

ডাক্তার সোরাবজি রাগের সঙ্গে বলিলেন, ও একটা লোফার—ওর সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে কেন ?ওরা হল ডোগরা—আমি আর্মিতে ছিলাম, ওরা যেখানে সাধারণ সেলাই-এর কাজ করে। সুবাদার হতে কাউকে দেখিনি। কেন জানেন ?

বলিলাম—কি ?

—খুব সাহস আছে, যা বলবেন তাই করবে—কিন্তু—

বলিয়া ডাক্তার সোরাবজি আঙুল দিয়া নিজের মাথায় দু-তিনবার টোকা দিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

—তাহলে বলে দেবেন দয়া করে।

—আজ্ঞে ওটা বলা আমাদের পক্ষে একটু শক্ত, বুঝতেই পারেন।

—আমি বললে একটু রূঢ় হয়ে যাবে।

—কিন্তু একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন—মিস সোরাবজির মনোভাব কেমন মি.শুকরামের ওপর, সেটা একবার—

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর মতো একটা বাজে অপদার্থ লোকের হাতে মেয়ে দেব ?ও কোনোকালে বি.এ. পাশ করতে পারবে ?কোনোদিন নয়। আমার মেয়ে অনার্স ক্লাসের ছাত্রী, সকলের চেয়ে ভালো ছাত্রী—ওর সঙ্গে তার বিয়ে। হাসির কথা।

পরদিন সকালে মুলো আমার কাছে আসিয়া গোপনে বলিল, মি. রায়, সব ঠিক হয়ে গেল।

—কি ঠিক হয়ে গেল মি.শুকরাম ?

—জালুর সঙ্গে বিয়ের। অবিশ্যি ওর সঙ্গেই কথা হল—ওর বাবা এখনো জানেন না।

—খুব খুশি হলাম শুনে। তবে ডাক্তার সোরাবজিকে একবার বলুন।

—সে হয়ে যাবে। তা—বললেও হয়।

নবীনদা শুনিয়া বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার—মুলোর সঙ্গে অমন একটি চমৎকার মেয়ের বিয়ে।

ইতিমধ্যে মুলোর পরীক্ষা পড়িল—সে বি.এ. পরীক্ষা দিয়া কিছুদিনের জন্য দেশে গেল। আমাদের বার বার অনুরোধ করিয়া গেল, আমরা যেন তাহাকে না ভুলি—চিঠি দিলে উত্তর দিই।

দুই মাস কাটিয়া গেল।

হঠাৎ একদিন আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য করিয়া দিয়া ডাক্তার সোরাবজি তাহার কন্যার বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। শুনিলাম পাত্র পুণার মেডিকেল অফিসার, আই এম এস পদবীর লোক। মোটা বেতন পান।

আমরা বন্ধুর প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়া বলিলাম,—ও, আমরা জানতাম মি. শুকরাম—

বৃদ্ধ ডাক্তার রাগতভাবে বলিলেন, সে একটা লোফার, আগেই বলেছি। গেজেটটা দেখেছেন ?তার নাম খুঁজে দেখবেন, কোথাও নেই। আর আমার মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে।

আমরা সত্যই দুঃখিত হইলাম। মুলোর জন্য।

এত কথার পর বিকালে যখন মুলো আসিয়া জানাইল মিস সোরাবজি ও আমাদের লইয়া সে পরদিন পিকনিকে যাইবে, তখন একটু আশ্চর্য হইয়া গেলাম। নবীনদা হাঙ্গামায় পড়ার ভয়ে প্রথমটা যাইতে চাহিলেন না...কিন্তু শেষে যখন মুলোর মুখে শুনিলাম, মিস সোরাবজির ভাইও এই সঙ্গে যোগ দিবে তখন আমাদের যাইতে কোনো আপত্তি রহিল না।

গোরেওয়াড়া হ্রদের ধারে পিকনিক ঠিক হইয়াছিল। পরদিন সকালে দল বাঁধিয়া দুখানা মোটরে হ্রদের ধারে গিয়া পৌঁছলাম। নাগপুরের পাহাড়ের মধ্যে যতগুলি হ্রদ আছে, এটি সর্বাপেক্ষা বড়, দৃশ্যও চমৎকার। আমরা উত্তর পাড় ধরিয়া হ্রদের ওপারে অনুচ্চ পাহাড়ের তলায় বড় বড় তিন্দুক গাছের ছায়াতে আমাদের বনভোজনের স্থান নির্দেশ করিলাম। মিস সোরাবজির ভাইটির বয়স চোদ্দ-পনেরোর বেশি নয়, বালক মাত্র—তাহার মনে দেখিলাম খুব ফুর্তি, হ্রদের জলে সাঁতার কাটিবার জন্য সে স্নানের পোশাক পর্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মিস সোরাবজি মেয়েটিকে ঠিক বোঝা কঠিন। এদিনও দেখিলাম মুলোর প্রতি তাহার যথেষ্ট আকর্ষণ, তাহার এতটুকু সুখ-সুবিধার জন্য মেয়েটির কি উদ্বেগ ! অবশ্য আমাদের দুজনের সঙ্গে সে ভালোভাবেই মিশিল। এতটুকু অহংকার নাই, বাঙালি মেয়ের মতনই সরলতা, পরের সুখ-সুবিধা দেখার অভ্যাস, নিজের হাতে সেবা করিবার ঝোঁক। সে যে বি.এ. ক্লাসের ভালো ছাত্রী, তাহার কথাবার্তা হইতে এতটুকু তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

আমাকে বলিল—মি. রায়, একটা বাংলা গান করুন না ?

আমি গান গাইতে ভালোই পারিতাম। এখন চর্চার অভাবে গলায় সুর নাই—সে আপত্তি বলা বাহুল্য টিকিল না, পর পর তিনটি রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতে হইল। বাঙালি-সমাজ নয়, বিশেষত কলিকাতা হইতে বহুদূরে, কাজেই ভুল ধরিবার কেহ নাই—বেপরোয়া হইয়া গাহিলাম। প্রশংসাও অর্জন করিলাম মুলো ও মিস সোরাবজির কাছে।

মিস সোরাবজি বলিল—টাগোরের কবিতা মুখস্থ আছে ?

—দু-একটা—

—আবৃত্তি করুন না ! আমাদের কলেজে মি. সেনের মেয়ে একবার করেছিল, বড় ভালো লেগেছিল আমার।

'জীবনদেবতা' কবিতাটি মুখস্থ ছিল ভালো, আমার মুখে শুনিয়া মিস সোরাবজি উচ্ছ্বসিত সুরে বলিল—ভারি সুন্দর !

তাহার পর সে তাহার শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া আবদারের সুরে বলিল—মি. রায়, আর একটা আবৃত্তি করবেন দয়া করে ?

—আগে আপনি একটা ইংরেজি আবৃত্তি করুন।

—করবেন তাহলে ?

মিস সোরাবজির খড়্গের মতো সূক্ষ্ম ও উগ্র নাসিকাকে ক্ষমা করিলাম, মেয়েটি অত্যন্ত চালবিহীন ও অমায়িক, তখনই সে ব্রাউনিঙের 'বৈয়াকরণের' শবযাত্রা বিখ্যাত কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিল।

পুনরায় আমাকে একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতে হইল। এবার হাত-মুখ নাড়িয়া শিশির ভাদুড়ির অনুকরণে 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করিয়া ইংরেজিতে ভাবার্থ বুঝাইয়া দিলাম। পূর্বের কবিতাটি অপেক্ষা এইটিই মিস সোরাবজির বেশি ভালো লাগিয়াছে, তাহা তাহার কথারসুরে ও চোখমুখের ভাবে আমার বুঝিতে দেরি হইল না। আমায় বলিল—দেখুন রায়, টাগোরের কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছি কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনি আর ঝংকারের মধ্য দিয়ে যে ওসব কবিতা এমন চমৎকার শোনায়, তা আমি আজ এই প্রথম জানলাম। এর আগে একবার বাংলা আবৃত্তি শুনেছিলাম কলেজে, সে তেমন কিছু নয়। আমার বাংলা শেখার বড় ইচ্ছে, কি করে শেখা যায় বলতে পারেন ?

মুলো দেখিলাম খুব খুশি হইয়াছে—কবিতা শুনিয়া নয়, কারণ সে সূক্ষ্ম রসবোধ তাহার ছিল না—বাংলা কবিতা ও প্রকারান্তরে বাঙালির প্রশংসা করা হইতেছে, এইজন্য। লোকটা অন্ধ বাঙালিভক্ত।

বলিল—জালু, তুমি মি. রায়ের কাছে কেন বাংলা শেখো না ! বেশ ভালো হবে—

মিস সোরাবজি পুনরায় আবদারের ভঙ্গিতে তাহার সুঠাম শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া বলিল— শেখাবেন আমাকে মি. রায় ?আমি রোজ আপনার বাসায় আসব এক ঘণ্টা করে ?

মুলো পরম উৎসাহের সুরে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ, বেশ !

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—ওর তাহলে বড় সুবিধে হয়, দু বেলা দেখা হয় কিনা ! মুলোর কাণ্ড দেখো—সাধে কি বলে হর্স র‍্যাডিশ।

মুলো মিস সোরাবজির সঙ্গে কথা কহিতে অন্যমনস্ক ছিল, নবীনদার বাংলা কথা শুনিতে পাইল না—নতুবা বলিত, হোয়াট ?কি বললে বাংলাতে ?

আমি ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বলিলাম—শেখালে তো বেশ হত—কিন্তু আমাদের সময় নেই কিনা। দুজনকে টো টো করে সারাদিন নিজের কাজে বেড়াতে হয়, নইলে এ তো বড় আনন্দের কথা।

আমরা গোরেওয়ারায় জলে নামিয়া সবাই স্নান করিলাম, মিস সোরাবজি পর্যন্ত। দুপুর ঘুরিয়া গিয়া একদিকে ছায়া পড়িয়াছে—এখনো সেদিনকার সেই দিনটি চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে—একদিকে অনুচ্চ কালো পাথরের পাহাড়, অন্যদিকে শিউলি ও তিন্দুক গাছের সারি, দু-দশটা বড় বড় শালও আছে। আকাশে খররৌদ্র, দুপুরের রোদে ঝক্‌ঝক্-করা চোখ-ঠিকরানো ছোট ছোট ঢেউ-এর সারি হ্রদের বুকে অথচ এপারে অনেকখানি ছায়াসিক্ত—আঁটসাট স্নানের পোশাকে শুভ্রদেহ কৃশাঙ্গী গোরেওয়ারার উঁচু পাড়ের উপর একটা বাংলো ধরনের বাড়ি বোধ হয় এক ডাকবাংলো।

আমরা রান্না করিয়া রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলাম, মিস সোরাবজির নিজের হাতের রান্নাভাত ও ডাল, কিছু মাংস, দু'একটা ভাজা। পার্শী ধরনের নুন দিয়া রান্না ভাত ও মশলাবিহীন সাদা রঙের মাংসের স্টু ও বেসনে টোমাটো ভাজা—সবগুলিই আমার মুখে সমান অখাদ্য। ভাগ্যে বুদ্ধি করিয়া নবীনদা কিছু আচার আনিয়াছিলেন—তাই দিয়া গ্রাস-কয়েক ভাত খাওয়া গেল ! মুলো পোষা কুকুরটির মতো মিস সোরাবজির পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার মতো বটে—দেখিলাম তাহার বাঙালি-প্রীতি তাহার প্রণয়িনীর প্রতি ভালোবাসা অপেক্ষা কম নয়। বাঙালির সব-কিছুর সে আজ ভক্ত, আমাদের কত কি ব্যাপারের প্রশংসা সে শতমুখে যদি বলিতে পারিত তাহার প্রণয়িনীর নিকট—তবে যেন তাহার তৃপ্তি হইত। বলিল, জানো জালু, ওঁরা বাংলাতে মুলো কথার বড্ড ব্যবহার করেন, প্রায়ই ওঁরা বলেন র‍্যাডিশ—আমি শিখে নিয়েছি, একটা বাংলা ইডিয়ম, মানে 'খুব ভালো' !

নবীনদা অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, মরেছে হতভাগা !

মিস সোরাবজি আমাদের দিকে চাহিয়া কৌতূহলের সুরে বলিল—ও হাউ ইন্টারেস্টিং। সত্যি। মি. রায়—আপনারা বুঝি—ইত্যাদি।

মেয়েটিকে যা-তা বুঝাইয়া ও অন্য কথা পাড়িয়া চাপা দিলাম জিনিসটা।

বেলা তিনটার সময় আমাদের মোটর নাগপুর হইতে ফিরিয়া গোরেওয়ারার ওপারে আসিয়া ভেঁপু দিল। সকালে পৌঁছাইয়া দিয়া গাড়ি দুখানা চলিয়া গিয়াছিল। আমরা যাওয়ার উদ্যোগ করিতে মিস সোরাবজি বলিল—সূর্যাস্তটা দেখে যাবেন না ?

—ওদিকে দেরি হয়ে যাবে ফিরতে—আপনার বাবা কি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না ?

—কিছু না মি. রায়, ভাববেন না। আমি বলে এসেছি—আমি ওই পাথরের ওপার থেকে দেখব সূর্যাস্তটা। তুমি এসো না শুকরাম !

—যেমন ইচ্ছে আপনার। শিগগির আসবেন।

অদ্ভুত সূর্যাস্ত। এখানে আসিয়া অবধি হাইল্যান্ড ড্রাইভ হইতে সাতপুরা শৈলমালার দিকে প্রায়ই দেখিতেছি। সন্ধ্যার ছায়া নামে, আমি সামান্য শৈত্যের জন্য গরম আলোয়ান ভালো করিয়া গায়ে টানিয়া দিই, হাইল্যান্ড ড্রাইভে সাহেব-মেমদের মোটরের ভিড় বাড়ে, আম্বারি লেকে পার্কে দলে দলে সুসজ্জিত নরনারী বেড়াইতে আসিতে আরম্ভ করে, আমি বড় একটা শাল গাছের তলায় নির্জনে প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া দেখি ধীরে ধীরে সাতপুরা শৈলশ্রেণীর আড়ালে লাল সূর্যটা নামিয়া পড়িতেছে। আজও দেখিলাম। গোরেওয়ারা হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি যেন আবীর-গোলা টকটকে লাল। যেমন সূর্য অস্ত গেল, অমনি চারিধারে ঘনছায়া নামিল, মোটর দুখানা অধীরভাবে ভেঁপু বাজাইতে লাগিল, বাদুড়ের দল পাহাড়ের দিকে ফিরিতে লাগিল, ক্রমে ছায়া ঘন হইয়া অন্ধকার নামিল।

নবীনদা বলিলেন,—কই, মিস সোরাবজি কোথায় ?

—এই তো ছিল, সূর্যাস্ত ভালো দেখা যাবে বলে পাথরটার ওপারে গিয়েছে বোধ হয়।

এমন সময় মুলোর সঙ্গে মিস সোরাবজি পাথরের ওপাশের ঘাট থেকে উঠিয়া আসিল। উভয়েই স্নান করিয়া আসিল এই অবেলায়, দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম।

মুলো কৈফিয়তের সুরে বলিল—বড় গরম, তাই জালু বললে, বেশ স্নান করা গেল।

নবীনদা বাংলায় বললেন—তার পর তোমার জালুর নিউমোনিয়া হলে তার বাবা দেখে নেবে তোমাকে—মুলোগিরি খাটবে না তখন—

মুলো বললে—কি ?

আমি উত্তর দিলাম, জালু নামটা বড় চমৎকার ! মি. বোসের মতে। অবশ্য আমারও সেই মত।

মিস সোরাবজি সলজ্জ হাসিয়া মেমসাহেবি সুরে বলিল—ও, ইউ হরিড ক্রিচার্‌স্

আমরা গাড়িতে উঠিয়া চলিলাম।

সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের কিছু পূর্বে পাহাড়ি ঢালুতে অনেক বনশিউলি ফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া মেয়েটি বলিল—ও মি. রায়, কি চমৎকার ফুল ফুটেছে ! শেফালি—না ?

মোটর থামাইয়া মুলো গোটাকয়েক ডাল ভাঙিয়া আনিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, জ্যোৎস্নার ক্ষীণ লেশ মাটির বুকে। সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের এদিকটা নির্জন, এ সময় খুব বেশি লোকজন নাই। হঠাৎ মেয়েটি বলিল—চলুন, আম্বাসিরি লেক দেখে আসি। এ জ্যোৎস্নায় বেশ লাগবে।

আমরা সকলেই হতবুদ্ধি। আম্বাসিরির দিকে যাইতে হইলে আবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে। বিপদে ফেলিল দেখিতেছি খেয়ালী পার্শী মেয়েটা। কি করা যায়, সুন্দরী তরুণীর আবদার উপেক্ষা করিবার সাধ্য নাই আমাদের—মোটর ঘুরাইয়া আবার সবাই পাহাড়ে উঠিয়া আম্বাসিরির দিকে ছুটিলাম। সেখানে লেকের ধারে পার্কে বিভিন্ন বেঞ্চিতে তখনো কেহ কেহ বসিয়া আছে। ক্রমে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া সেদিনকার খিন্‌সি লেকের স্মৃতি মনের মধ্যে আনিয়া দিল। পাহাড়ের উপর হু-হু ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরিল। জনবিরল হ্রদ-তীরের পার্কটিতে দূরে দূরে দু-একটি নরনারী বেড়াইতেছে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সবাই নামিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই আরো চমৎকার লাগিতেছিল, নতুবা সাধারণত আম্বাসিরিতে বিকালের দিকে বড় ভিড় থাকে।

মিস সোরাবজিকে বলিলাম—কেমন লাগছে ?

সে মেমসাহেবী সুরে সরু মিষ্টি গলায় টানিয়া টানিয়া বলিল—ও, ইট্‌'জ ফা-ই-ন !

'ফা' হইতে 'ন' পর্যন্ত টানিয়া সুরের নামা-ওঠা করিয়া উচ্চারণ করিতে প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সময় লইয়া মধুর ধরনে গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বলিল। এই তো কলেজের ছাত্রী, কতই বা বয়স, কুড়ি-একুশের বেশি নয়—এ সব শিখিল কোথা হইতে কে জানে ! নবীনদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাংলায় বলিল—মেয়েটার আবার ভাবন দেখছ ?

আমিও বাংলায় বলিলাম—আমেরিকান ফিল্ম থেকে হলিউডের অ্যাকট্রেসদের সুর নকল করেছে কষ্ট করে। গলা মিষ্টি বলে মানিয়েছে।

মুলোর মনে কোনো কবিত্ব নাই। সে দেখিলাম মেয়েটির সহিত সুতা ও চরকা কাটা সম্পর্কে কি কথা বলিতেছে। মিস সোরাবজি আমার কাছে আসিয়া বলিল,—একটা কবিতা বলতে হবে—বলুন ! এমন জায়গায় টাগোরের কবিতা একটি শুনব !

আবৃত্তি করিলাম—কি আর করি ! মেয়েটির প্রাণে দেখিলাম সত্যই কবিত্ব আছে। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল প্রশংসায়। কিছু না বুঝিলেও ভাষার ধ্বনিতে ও ঝংকারে তাহার মন মাতিয়া উঠিয়াছে। সে আমাদের অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় শেলির একটি কবিতা আবৃত্তি করিল।

বলিলাম—গান করুন না একটা।

মিস সোরাবজি হাসিয়া বলিল—ইংরিজি গান জানি, আপনাদের পছন্দ হবে না।

—ভারতীয় মেয়ে, দিশি গান শেখেননি কেন ?

—আমাদের কমিউনিটির সাহেবিয়ানা এজন্যে দায়ী মি. রায়। বাবা গভর্নেস রেখে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন, গান শিখিয়েছেন—তাঁরা যে পথে নিয়ে গিয়েছে, সেই পথে যেতে হয়েছে আমায়। এখন জ্ঞান হয়ে সব বুঝতে পারি। এখন আমি গান্ধীবাদী, তা জানেন ?খদ্দর পরি অনেক সময়, মা পরতে দেন না—এই হল কথা। ইচ্ছে হয় আমি শিখি ভারতীয় গান—খুব ভালো লাগে আমার।

নবীনদা হাসিয়া মনের আনন্দে একটা ভাটিয়ালি গান বেসুরে গাহিয়া ফেলিলেন। মিস সোরাবজিকে ইংরিজিতে তাহার অর্থও বুঝাইয়া দেওয়া হইল। গানে, গল্পে, কবিতা-আবৃত্তিতে হাসিখুশিতে সারাদিনটা কাটাইয়া রাত্রে যখন বাড়ি আসিয়া শুইয়া পড়িলাম—তখন যেন মাথার মধ্যে উগ্র মদের নেশা। নবীনদারও তাই, কারণ—তিনি আসিয়া পর্যন্ত গুন গুন করিয়া গান করিতেছিলেন।

মিস সোরাবজির বিবাহের অল্পদিন পরেই আমরা দুই বন্ধু নাগপুর হইতে চলিয়া গেলাম। বছরখানেক পরে আবার একবার বিশেষ কাজে নাগপুরে আসি।

সংবাদ লইয়া শুনিলাম বৃদ্ধ ডাক্তার সোরাবজি ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ কেহই এখানে নাই—বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহারা বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে।

মুলোর খবর জানিবার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কাহাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করিব বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার সোরাবজি শহরের বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে সকলের নিকটই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মুলো জনৈক বিদেশী তরুণ ছাত্র—অমন ছাত্র নাগপুরে বহু আছে—কে কাহার খবর রাখে ! আমরা ছাড়া আর সে কাহার সঙ্গে মিশিত জানি না, সুতরাং মুলোর খোঁজ লইবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপায় হইল না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সপ্তাহখানেকের মধ্যে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে গোরেওয়ারা হ্রদে বেড়াইতে গিয়া মুলোর দেখা পাইলাম। নবীনদা তাহাকে প্রথম দেখেন। একখানা পাথরে ঠেস দিয়া কে একজন নির্জন বসিয়া আছে দেখিয়া নবীনদাই বলিলেন—ওখানে কে দেখো তো হে !

গোরেওয়ারা শহর হইতে বহুদূরে, এত দূরে কেহ বেড়াইতে আসে না সাধারণত— স্থানটাও নির্জন পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে। আমি একটু কাছে গিয়া দেখি—মুলো ! নিখুঁত সাহেবি পোশাক পরাসেই রকমই, তবে দাড়ি কামায় নাই, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা।

ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—মুলো একখানা খাতাতে কি লিখিতেছে। এত নিবিষ্টমনে লিখিতেছে যে, আমার পদশব্দ সে শুনিতে পাইল না। কবি হইয়া গেল নাকি ছোকরা ?

তাহার পর আমাদের সঙ্গে সে নাগপুরে ফিরিল। শুনিলাম সে এবারও পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পাইয়া মুলো ছেলেমানুষের মতো খুশি। চাপেবার দুগ্ধমন্দিরে লইয়া গিয়া আমাদের মিষ্টান্ন শরবত খাওয়াইয়া দিল। শুনিলাম দেশে তাহার মা মারা গিয়াছেন এই বৎসরেই।

বলিল—বড্ড একলা একলা বোধ করি এখানে। মিশব কার সঙ্গে ?এখানে মেশবার লোক নেই। বাঙালিদের সঙ্গে মিশে আরাম। গোরেওয়ারা লেকে মাঝে মাঝে গিয়ে বসে থাকি। বেশ লাগে। একদিন ওখানে বেশ কেটেছিল। মনে আছে সেই আমাদের পিকনিক ?ওরা কোথায় যে তাতো জানি নে !

দেখিলাম মুলোর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একটা ছবি—কয়েক শত বৎসর পূর্বের রাজপুতানায় বিশাল মরুভূমির মধ্যে উটের পিঠে চড়িয়া সেই বীর পূর্বপুরুষ চলিয়াছে জয়সিংহের সৈন্যদলের সহিত দেওধার যুদ্ধে, সেলিমগড়ের যুদ্ধে—চওড়া গালপাট্টাওয়ালা রুক্ষদর্শন মুখাবয়ব, দীর্ঘদেহ, পাশে খোলা দীর্ঘ দুধার তলোয়ার, হাতে সাত হাত লম্বা বন্দুক—মৃদুতা নাই, ভয় নাই—কবাটের মতো বিশাল বক্ষে জ্বলন্ত দুঃসাহস—কাহার সাধ্য ছিল তাহার মনোনীত কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ছিনাইয়া আনিত তাহার প্রণয়িনীকে যে কোনো লোকের হাত হইতে। লড়িত, খুন করিত।

আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় জয়সিংহের সৈন্যদলের সেই বীর নায়কের বংশধর এই সাহেবি পোশাক পরা, নিখুঁত টাই বাঁধা, ঘাড় চাঁচা, ক্লিন শেভ্ড্, হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধা ছোকরা নিতান্ত নিরুপায়। কবিতা লেখা বা চোখের জল ফেলা ছাড়া সে হারানো প্রণয়িনীর জন্য কি করিতে পারে ?বিশেষত যখন দুইবার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি না পাইয়া সে আরো দমিয়া গিয়াছে !

ছোকরার জন্য এই সর্বপ্রথম দুঃখ হইল।